ইউনিট
৭

কৃষিজ উৎপাদন: ফসল

ভূমিকা:

বিভিন্ন প্রকার মাঠ ফসল, উদ্যান ফসল, ঔষধি গাছপালা, মাছ চাষ, গৃহপালিত পশুপাখি পালন ইত্যাদির উৎপাদনকেই মূলত কৃষিজ উৎপাদন বলা হয়। মানুষের জীবনযাত্রা সচল রাখতে কৃষিজ উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই। মানুষ পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন খাদ্য খেতে হয়। আর এই খাদ্য আসে সরাসরি ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে। এরকম ফসল হলো ধান, গম, ভূট্টা, যব, কাওন ইত্যাদি। খাদ্য ছাড়াও মানুষের বিভিন্ন রকম চাহিদা আছে। এই চাহিদা মেটাবার জন্য মানুষ আদিকাল থেকে বিভিন্ন রকম ফসল চাষ করে আসছে। যেমন- পাট, তুলা, চা ইত্যাদি। দিনে দিনে জন্যসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে পুরনো দিনের পদ্ধতি দ্বারা উৎপাদিত ফসল মানুষের চাহিদা মেটাতে পারছে না। এজন্য কৃষিবিজ্ঞানীগণ নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। উদ্ভাবিত এসব কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিভিন্ন ফসলের ফলন আগের চেয়ে বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। যাহোক এ ইউনিটে ফসল পরিচিতি ও গুরুত্ব, ধান, পাট, সরিষা ও মাস কালাই এর চাষ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৪ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৭.১ : ফসল পরিচিতি ও গুরুত্ব
পাঠ - ৭.২ : ধান চাষ
পাঠ - ৭.৩ : পাট চাষ
পাঠ - ৭.৪ : সরিষা চাষ
পাঠ - ৭.৫ : মাসকালাই চাষ

পাঠ-৭.১ ফসল পরিচিতি ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ফসল ও মাঠ ফসলের সংজ্ঞা দিতে পারবেন ।
- মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসলের পার্থক্য বলতে পারবেন ।
- মাঠ ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন ।
- প্রধান প্রধান মাঠ ফসলের বাংলা, ইংরেজি ও বৈজ্ঞানিক নাম বলতে পারবেন ।
- ফসলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	কৃষিজ উৎপাদন, ফসল, মাঠ ফসল, উদ্যান ফসল, উদ্ভিদজাত খাদ্য ।

আদিকালে মানুষ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করত । পরবর্তীতে তারা ধীরে ধীরে বুঝতে শিখল যে, একেক ধরনের উদ্ভিদ থেকে একেক ধরনের দ্রব্য উৎপন্ন হয় । কোনো উদ্ভিদ থেকে দানা, কোনো উদ্ভিদ থেকে চিনি, কোনো উদ্ভিদ থেকে আঁশ ইত্যাদি পাওয়া যায় । মানুষ এসব উদ্ভিদকে সংগ্রহ করে যত্নের সাথে চাষ করে এবং নিজেদের প্রয়োজন মেটায় । সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্ব সম্পন্ন যে সমস্ত উদ্ভিদ বা গাছপালা মানুষ যত্নের সাথে মাঠে চাষ করে, সেগুলোকে মাঠ ফসল (Field crops) বলা হয় । জমিনে জন্মানো সব উদ্ভিদই ফসল নয় তাই মানুষ প্রয়োজনে যে সমস্ত গাছপালার চাষ করে সেগুলোকেই ফসল বলা হয় ।

সাধারণভাবে কৃষিতাত্ত্বিক ফসলগুলোকে (Agronomic crops) মাঠ ফসল এবং বাগান ফসলগুলোকে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল (Horticultural crops) বলা হয় । জমি তৈরি থেকে শুরু করে বীজ উৎপাদন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসলে যত্নের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসলের পার্থক্য নিচে তুলে ধরা হলো-

মাঠ ফসল	উদ্যান ফসল
১ । মাঠ ফসল সাধারণত সমষ্টিগতভাবে চাষ করা হয় । যেমন- ধান, গম, পাট ইত্যাদি ।	১ । সাধারণত প্রতিটি গাছকে এককভাবে যত্ন নেয়া হয় । যেমন- আম, জাম, কলা ইত্যাদি ।
২ । মাঠ ফসলে সাধারণত বেড়া নির্মাণের প্রয়োজন হয় না ।	২ । উদ্যান ফসলে বেড়া নির্মাণের প্রয়োজন হয় ।
৩ । মাঠ ফসল সাধারণত এক সাথে পরিপক্ক হয় বিধায় এক সাথেই সংগ্রহ করা হয় ।	৩ । উদ্যান ফসল পর্যায়ক্রমে পরিপক্ক হয় বিধায় ধাপে ধাপে সংগ্রহ করা হয় । যেমন- টমেটো, বেগুন ইত্যাদি ।
৪ । মাঠ ফসল সাধারণত শুকিয়ে ব্যবহার করা হয় । যেমন- ধান, পাট, ডাল ইত্যাদি ।	৪ । উদ্যান ফসল সাধারণত তাজা অবস্থায় ব্যবহার করা হয় । যেমন-বিভিন্ন ধরনের সবজি ও ফল ।

বিভিন্ন ধরনের মাঠ ফসল আমরা জমিতে জন্মাতে দেখি । এবার দেখা যাক মাঠ ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ কী?

১ । তন্তুল বা দানাজাতীয় শস্য: এরা গ্রামিনী পরিবারের অন্তর্গত । এ পরিবারের খাবার উপযোগী দানা জাতীয় শস্যগুলোকেই তন্তুল ফসল বলে । যেমন- ধান, গম, ভূট্টা, যব, চীনা, কাওন ইত্যাদি ।

২ । ডাল ফসল: লিগুমিনোসি পরিবারের প্যাপিলিওনেসি উপ-পরিবারের যে সমস্ত দানাজাতীয় ফসল ডালের জন্য চাষ করা হয়, সেগুলোকে ডাল ফসল বলা হয় । যেমন- মসুর, খেসারি, মুগ, ছোলা, মাসকালাই ইত্যাদি ।

৩। তৈল ফসল: যে সমস্ত ফসলের বীজ থেকে তেল সংগ্রহ করা হয়। সেগুলোকে তৈল ফসল বলা হয়। যেমন- সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

৪। চিনি ফসল: যে সমস্ত ফসলের রস থেকে মিষ্টিজাতীয় পদার্থ যেমন- চিনি, গুড়, মিছরি ইত্যাদি তৈরি করা হয়, সেগুলোকে চিনি ফসল বলে। যেমন- আখ, বিট, খেজুর, তাল ইত্যাদি। খেজুর, তাল মাঠ ফসলের আওতাধীন না হলেও এরা চিনি ফসলের অন্তর্ভুক্ত।

৫। আঁশ ফসল: আঁশ পাওয়ার জন্য যে সমস্ত ফসল চাষ করা হয়, সেগুলোকে আঁশ ফসল বলা হয়। যেমন- পাট, তুলা, শনপাট, কেনাফ, রামী ইত্যাদি।

৬। নেশা ফসল: নেশাজাতীয় দ্রব্য উৎপাদানের জন্য যে সমস্ত ফসল চাষ করা হয়, সেগুলোকে নেশা ফসল বলে। যেমন- তামাক, গাঁজা, আফিম, কুম্ভি, হেনবেন ইত্যাদি।

৭। পানীয় ফসল: যে সকল ফসল পানীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য চাষ করা হয়, সেগুলোকে পানীয় ফসল বলে। যেমন- চা, কফি, কোকো ইত্যাদি।

৮। পশুখাদ্য ফসল: পশুর খাদ্যের জন্য যে সমস্ত ফসল চাষ করা হয়। সেগুলোকে পশুখাদ্য ফসল বলে। যেমন- প্যারা ঘাস, নেপিয়ার ঘাস, ভূট্টা, জোয়ার, খেসারি, মাসকালাই ইত্যাদি।

৯। সবুজ সার ফসল: যে সমস্ত সবুজ ফসল জন্মানোর একটা নির্দিষ্ট সময় পর মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে জৈব সার তৈরির জন্য চাষ করা হয়, সেগুলোকে সবুজ সার ফসল বলে। যেমন- ধইঞ্চা, শনপাট ইত্যাদি।

নিচে প্রধান প্রধান কিছু ফসলের বাংলা, ইংরেজি ও বৈজ্ঞানিক নাম উল্লেখ করা হলো-

ক্রম	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১.	ধান	Rice	*Oryza Sativa*
২.	গম	Wheat	*Triticum aestivum*
৩.	ভূট্টা	Maize	*Zea mays*
৪.	যব	Barley	*Hordeum vulgare*
৫.	কাওন	Foxtail millet	*Selaria italica*
৬.	ছোলা	gram	*Cicer arietinum*
৭.	মাসকালাই	Black gram	*Vigna mungo*
৮.	মুগ	Green gram	*Vigna radiata*
৯.	মসুর	Lentil	*Lens culinaris*
১০.	সয়াবিন	Soyabean	*Glycine max*
১১.	সরিষা	Mustard	*Brassica napus*
১২.	সূর্যমুখী	Sunflower	*Helianthus annus*
১৩.	আখ	Sugarcane	*Saccharum officinarum*
১৪.	তামাক	Tobacco	*Nicotiana tabacum*
১৫.	দেশী পাট	Deshi Jute	*Corchrus capsularis*
১৬.	দেশী তুলা	Deshi Cotton	*Gossypium arboreum*
১৭.	চা	Tea	*Comellia sinensis*
১৮.	কফি	Coffee	*Coffea arabica*
১৯.	প্যারা ঘাস	Para grass	*Brachiaria mutica*
২০.	নেপিয়ার ঘাস	Napier grass	*Pennisetum purpureum*

ফসল চাষের গুরুত্ব

বেঁচে থাকার জন্য মানুষের পুষ্টির প্রয়োজন। আর এই পুষ্টি উপাদান আসে বিভিন্ন প্রকার খাবার থেকে। ফসল, পশুপাখি ও মাছ থেকে আমরা আমাদের খাবার পেয়ে থাকি। জীবনকে সুস্থ, সবল, সচল, কর্মক্ষম ও দেহের বৃদ্ধিসাধনের জন্য যে সব উদ্ভিদজাত দ্রব্য প্রয়োজন হয় সেগুলোকে উদ্ভিদজাত খাদ্য বলা হয়। ফসল হলো মানুষের খাদ্যের প্রধান উৎস। বিভিন্ন প্রকার ফসলের মধ্যে ধান আমাদের প্রধান। কারণ ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। সারা বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই খাদ্য হিসেবে ভাত গ্রহণ করে। বাংলাদেশে মোট আবাদি জমির প্রায় ৮০% জমিতেই ধান চাষ করা হয়। পার্শ্ববতী ভারতে ধান চাষে সবচেয়ে বেশি জমি ব্যবহত হয়। ধান প্রধানত শর্করা জাতীয় খাবারের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। তবে এতে ৮% আমিষও রয়েছে। বাচ্চা থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষ নিরাপদে এ খাবার খেতে পারে।

মসুর, ছোলা, মুগ, অড়হর, মটর, মাসকালাই ইত্যাদি ডালজাতীয় ফসল মাঠে চাষ করা হয়। এ ফসলগুলো আমিষ সমৃদ্ধ ও মাংসের তুলনায় সস্তা বিধায় এদেরকে গরীবের মাংস বলা হয়। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে ভূমির উর্বরতা রক্ষায় এজাতীয় ফসল অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। নিবিড় শস্য চাষ করলে জমিতে জৈব পদার্থ ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। জৈব পদার্থ হলো মাটির প্রাণ। ডালজাতীয় শস্য চাষ করলে মাটিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেন সার যোগ হয়। এ জাতীয় ফসল মানুষের পুষ্টির পাশাপাশি আমিষ সমৃদ্ধ পশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া তৈলবীজ ফসল আমাদের স্নেহজাতীয় পদার্থের যোগান দিয়ে থাকে। আঁশজাতীয় ফসল চাষ করে আমরা আমাদের দৈনন্দিন অনেক চাহিদাই মিটিয়ে থাকি। কিছু আঁশ ফসল আছে যেগুলো রপ্তানি করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়। মোদ্দা কথা ফসলের চাষাবাদ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং পুষ্টিহীনতা দূর করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পুষ্টির যোগান দিতে এদের অবদান অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ এলাকার চাষকৃত ফসলের পরিচিতি ও গুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দিবে।

সারসংক্ষেপ

কৃষিজ উৎপাদন বলতে বিভিন্ন ধরনের মাঠ ও উদ্যান ফসল ঔষধি গাছপালা, গৃহপালিত পশুপাখি মাছ ইত্যাদির চাষ বা উৎপাদনকে বুঝানো হয়ে থাকে। আদিকালে মানুষ বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে তারা জানতে পারল যে, একেক উদ্ভিদ থেকে একেক ধরনের দ্রব্য উৎপন্ন হয়। মাঠে সমষ্টিগতভাবে চাষ করা হয় এবং যাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে এমন ফসলকে মাঠ ফসল বলে। আবার বাগান ফসল যেখানে প্রতিটি গাছকে আলাদাভাবে যত্ন নেবার প্রয়োজন হয়, তাদেরকে উদ্যান ফসল বলা হয়। মানুষের জীবনকে সুস্থ, সচল, সবল, কর্মক্ষম ও দেহের বৃদ্ধিসাধনের জন্য উদ্ভিদজাত খাবার অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। মাঠ ফসল কোনটি?
ক) টমেটো খ) বেগুন গ) গম ঘ) কলা

২। নিচের কোনটি পানীয় ফসল?
ক) সূর্যমুখী খ) ছোলা গ) মুগ ঘ) কোকো

৩। মাঠ ফসল হলো-
i) তিল, তিসি, তুলা
ii) ভূট্টা, খেসারী, মাসকালাই
ii) জবা, জাম, দারুচিনি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সোহাগ মিয়া বিএ পাস করার পর বসে না থেকে নিজ জমিতে নানা প্রকার ফসল চাষ করবেন বলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকট থেকে ফসলের পরিচিতি জ্ঞান লাভ করেন।

৪। ভূট্টা গাছের বৈজ্ঞানিক নাম কোনটি?
ক) Zea mize খ) Zea maiz
গ) Zea mays ঘ) Zea May

৫। নিচের কোনটি উদ্যান ফসল নয়?
ক) জবা খ) কাঁঠাল
গ) ঢেঁড়শ ঘ) খেসারী

পাঠ-৭.২ ধান চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ধান চাষের জমি নির্বাচন করতে পারবেন।
- ধানের উন্নত জাতের নাম বলতে পারবেন।
- ধানের উচ্চ ফলনশীল জাতের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- ধানের বীজ বাছাই, শোধন ও চারা তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বীজতলার পরিচর্যা, চারা উঠানো, পরিবহন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ধানের জমি তৈরি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ধানের চারা রোপণের পদ্ধতি ও পরিচর্যা সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।
- ধানের বালাই আক্রমনের লক্ষণসমূহ ও প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধান ফসলের কর্তন, মাড়াই ও সংরক্ষণের বিবরণ দিতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ধান চাষ, উন্নত জাত, চারা তৈরি, বীজতলা, পরিচর্যা, বালাই, কর্তন, মাড়াই ও সংরক্ষণ।

ধান বাংলাদেশের প্রধান দানা জাতীয় ফসল এবং প্রধান খাদ্য। বিশ্বের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ৯২ শতাংশ ধান এশিয়া দেশ গুলোতে উৎপন্ন হয়। চাষাবাদের মৌসুম অনুযায়ী ধানের ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

১। আউশ ধান: মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়।
২। আমন ধান: জুন থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়।
৩। বোরো ধান: নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়।

জলবায়ু

ব্যাপক ও বিস্তৃত জলবায়ুতে ধান চাষ করা যায়। ধান চাষের জন্য উপযোগি তাপমাত্রা হলো ২০-২৫° সে.। বৃষ্টিপাত কম হলে সেচ দিতে হবে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪০% এর কম ও ৯৫% এর বেশি হলে পুষ্পায়ন ব্যাহত হয়।

জাত

বাংলাদেশে তিন জাতের ধান আছে।

১। **স্থানীয় জাত :** টেপি, গিরবি, দুধসর, লতিশাইল ইত্যাদি।
২। **স্থানীয় অনুমোদিত জাত :** হবিগঞ্জ, কটকতারা, পাজাম, কালিজিরা, হাসিকলমি, নাইজার শাইল, লতিশাইল, বিনাশাইল ইত্যাদি।
৩। **উচ্চ ফলনশীল জাত :** মুক্তা, ময়না, শাহজালাল, মঙ্গল, নিজামী ইত্যাদি।

নিচে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের ধানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

১। ধান গাছ খাটো ও শক্ত হয় এবং সহজে হেলে পড়ে না।
২। ধান গাছের পাতা ঘন সবুজ ও পুরু থাকে।

৩। পাতাগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে একটি অন্যটিকে ঢেকে রাখে না। এতে আলো–বাতাস প্রতিটি পাতা সমানভাবে পায় এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি তৈরি হয়।
৪। গাছ মাটি থেকে বেশি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে।
৫। জমি থেকে উৎপাদিত ধানের ওজন ও খড়ের ওজন প্রায় সমান হয় অর্থাৎ ১ঃ১।
৬। পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ কম হয়।
৭। পাকার সময়ও কিছু কিছু ধান সবুজ থাকে।

বাংলাদেশে মোট ৮১টি উফশী জাত রয়েছে যার মধ্যে ৭৫টি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং ১৬টি বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে। নিচের তালিকাতে এর জাতগুলির নাম, জন্মানোর মৌসুম, গড় জীবনকাল, গড় ফলন এবং চালের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

ধানের জাত	মৌসুম	গড় জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	বৈশিষ্ট্য
বিআর ১ (চান্দিনা)	বোরো আউশ	১৫০ ১২০	৫.৫ ৪.০	চাল খাটো মোটা
বিআর ২ (মালা)	বোরো আউশ	১৬০ ১২৫	৫.০ ৪.০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
বিআর ৩ (বিপ্লব)	বোরো আউশ আমন	১৭০ ১৩০ ১৪৫	৬.৫ ৪.০ ৪.০	চাল মাঝারি মোটা ও পেটে সাদা দাগ আছে।
বিআর ৪ (ব্রিশাইল)	আমন	১৪৫	৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
বিআর ৫ (দুলাভেগ)	আমন	১৪৫	৩.০	চাল ছোট, গোলাকৃতি ও সুগন্ধি
বিআর ৬	বোরো আউশ	১৪০ ১১০	৪.৫ ৩.৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা
বিআর ৭ (ব্রিবালাম)	বোরো আউশ	১৫৫ ১৩০	৪.৫ ৩.৫	চাল লম্বা, চিকন
বিআর ৮ (আশা)	বোরো আউশ	১৬০ ১২৫	৬.০ ৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও পেটে দাগ আছে, শিলাবৃষ্টি প্রবন এলাকার উপযোগী
বিআর ৯ (সুফলা)	বোরো আউশ	১৫৫ ১২০	৬.০ ৫.০	চাল লম্বা, মাঝারি মোটা ও সাদা এবং শিলা বৃষ্টি প্রবণ এলাকায় উপযোগী
বিআর ১০ (প্রগতি)	আমন	১৫০	৫.৫	চাল মাঝারি চিকন
বিআর ১১ (মুক্তা)	আমন	১৪৫	৬.৫	চাল মাঝারি মোটা
বিআর ১২ (ময়না)	বোরো আউশ	১৭০ ১৩০	৫.৫ ৪.৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
বিআর ১৪ (গাজী)	বোরো আউশ	১৬০ ১২০	৬.০ ৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
বিআর ১৫ (মোহিনী)	বোরো আউশ	১৬৫ ১২৫	৫.৫ ৫.০	চাল মাঝারি চিকন, সাদা
বিআর ১৬ (শাহী বালাম)	বোরো আউশ	১৬৫ ১৩০	৬.০ ৫.০	চাল লম্বা চিকন, সাদা
বিআর ১৭ (হাসি)	বোরো	১৫৫	৬.০	চাল মাঝারি মোটা
বিআর ১৮ (শাহজালাল)	বোরো	১৭০	৬.০	চাল মাঝারি মোটা, সাদা ও হাওড় অঞ্চলে

ধানের জাত	মৌসুম	গড় জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	বৈশিষ্ট্য
				উপযোগী
বিআর ১৯ (মঙ্গল)	বোরো	১৭০	৬.০	চাল মাঝারি মোটা ও হাওড় অঞ্চলের উপযোগী
বিআর ২০ (নিজামী)	আউশ	১১৫	৩.৫	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপন উপযোগী
বিআর ২১ (নিয়ামত)	আউল	১১০	৩.০	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপন উপযোগী
বিআর ২২ (কিরণ)	আমন	১৫০	৫.০	চাল খাটো, মোটা ও নাবী জাত
বিআর ২৩ (দিশারী)	আমন	১৫০	৫.৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং নাবী জাত
বিআর ২৪ (রহমত)	আউশ	১০৫	৩.৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং সরাসরি বপন উপযোগী
বিআর ২৫ (নয়াপাজাম)	আমন	১৩৫	৪.৫	চাল খাটো, মোটা ও সাদা
বিআর ২৬ (শ্রাবণী)	আউশ	১১৫	৪.০	চাল চিকন, লম্বা ও সাদা এবং এ্যামাইলেজ কম
ব্রি ধান ২৭	আউশ	১১৫	৪.০	চাল মাঝারি চিকন ও মোটা এবং বরিশাল অঞ্চলের উপযোগী
ব্রি ধান ২৮	বোরো	১৪০	৬.০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
ব্রি ধান ২৯	বোরো	১৬০	৭.৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
ব্রি ধান ৩০	আমন	১৪৫	৫.০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
ব্রি ধান ৩১	আমন	১৪০	৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
ব্রি ধান ৩২	আমন	১৩০	৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
ব্রি ধান ৩৩	আমন	১১৮	৪.৫	চাল খাটো, মোটা, পেটে সাদা দাগ আছে
ব্রি ধান ৩৪	আমন	১৩৫	৩.৫	চাল খাটো, মোটা ও সুগন্ধি
ব্রি ধান ৩৫	বোরো	১৫৫	৫.০	চাল খাটো, মোটা ও বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী
ব্রি ধান ৩৬	বোরো	১৪০	৫.০	চাল লম্বা, চিকন, ঠান্ডা এবং সহনশীল
ব্রি ধান ৩৭	আমন	১৪০	৩.৫	চাল মাঝাারি, চিকন ও সুগন্ধি
ব্রি ধান ৩৮	আমন	১৪০	৩.৫	চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি
ব্রি ধান ৩৯	আমন	১২২	৪.৫	চাল লম্বা ও চিকন
ব্রি ধান ৪০	আমন	১৪৫	৪.৫	চাল মাঝাারি, মোটা ও লবণ সহনশীল
ব্রি ধান ৪১	আমন	১৪৮	৪.৫	চাল লম্বাটে মোটা ও লবণ সহনশীল
ব্রি ধান ৪২	আউশ	১০০	৩.৫	চাল মাঝাারি, সাদা ও খরা সহনশীল
ব্রি ধান ৪৩	আউশ	১০০	৩.৫	চাল মাঝাারি, সাদা ও খরা সহনশীল
ব্রি ধান ৪৪	আমন	১৪৫	৫.৫	চাল মোটা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের উপযোগী
ব্রি ধান ৪৫	বোরো	১৪০	৬.৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
ব্রি ধান ৪৬	আমন	১৫০	৪.৭	চাল মাঝারি, নাবি জাত ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণযোগ্য
ব্রি ধান ৪৭	বোরো	১৫২	৬.০	চাল মাঝারি মোটা, চারা অবস্থায় লবণ সহনশীলতা ১২-১৪ ডিএস/মিটার এবং বাকি জীবনকালে ৬ ডিএস/মিটার
ব্রি ধান ৪৮	আউশ	১১০	৫.৫	চাল মাঝারি মোট, ভাত ঝরঝরে

ধানের জাত	মৌসুম	গড় জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	বৈশিষ্ট্য
ব্রি ধান ৪৯	আমন	১৩৫	৫.৫	চাল মাঝারি চিকন
ব্রি ধান ৫০	বোরো	১৫৫	৬.০	চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি
ব্রি ধান ৫১	আমন	১৪২ (জলমগ্ন না হলে) ১৫৪ (১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে)	৪.৫	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা
ব্রি ধান ৫২	আমন	১৪৫ (জলমগ্ন না হলে) ১৫৫ (১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে)	৪.০	চাল মাঝারি মোটা
ব্রি ধান ৫৩	আমন	১২৫	৫.০	চাল মাঝারি চিকন
ব্রি ধান ৫৪	আমন	১৩৫	৪.৫	চাল মাঝারি চিকন
ব্রি ধান ৫৫	বোরো আউশ	১৪৫ ১০৫	৭.০	চাল লম্বা ও চিকন
ব্রি ধান ৫৬	আমন	১১০	৫.০	চাল লম্বা ও সাদা
ব্রি ধান ৫৭	আমন	১০৫	৪.৫	চাল লম্বা ও সরু
ব্রি ধান ৫৮	বোরো	১৫৫	৭.২	চাল অনেকটা ব্রি ধান ২৯-এর মতো, তবে সামান্য চিকন
ব্রি ধান ৫৯	বোরো	১৫৩	৭.১	চাল মাঝারি মোটা এবং সাদা, ডিগ পাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ এবং হেলে পড়ে না
ব্রি ধান ৬০	বোরো	১৫১	৭.৩	চাল লম্বা ও সরু এবং সাদা
ব্রি ধান ৬১	বোরো	১৫০	৬.৩	চাল মাঝারি সরু, সাদা এবং লবণাক্ততা সহনশীল
ব্রি ধান ৬২	আমন	১০০	৫.৫	চাল লম্বা, সরু এবং সাদা, মধ্যম মাত্রার জিঙ্ক সমৃদ্ধ আগাম জাত
ব্রি ধান ৬৩	বোরো	১৫০	৭.০	চাল লম্বা ও সরু
ব্রি ধান ৬৪	বোরো	১৫২	৬.০	চাল মাঝারি মোটা এবেং উষ্ণ মাত্রায় জিঙ্ক সমৃদ্ধ
ব্রি ধান ৬৫	আউশ	৯৯	৩.৫	চাল মাঝারি চিকন, সাদা, ডিগ পাতা খাড়া এবং গাছ ছোট হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না এবং খরা সহিষ্ণু
ব্রি ধান ৬৬	আমন	১১৩	৪.৫	চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা, সাদা, প্রজনন পর্যায়ে খরা সহনশীল, উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ
ব্রি ধান ৬৭	বোরো	১৪৩	৬.০	চাল মাঝারি চিকন, সাদা এবং সম্পূর্ণ জীবনকালে ৮ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল
ব্রি ধান ৬৮	বোরো	১৪৯	৭.৩	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ধান পাকার সময় ডিগ পাতা সবুজ থাকে
ব্রি ধান ৬৯	বোরো	১৫৩	৭.০	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং উপকরণ সাশ্রয়ী জাত
ব্রি হাইব্রিড ধান ১	বোরো	১৫৫	৮.৫	চাল মাঝারি চিকন স্বচ্ছ ও সাদা

ধানের জাত	মৌসুম	গড় জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	বৈশিষ্ট্য
ব্রি হাইব্রিড ধান ২	বোরো	১৪৫	৮.০	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম
ব্রি হাইব্রিড ধান ৩	বোরো	১৪৫	৯.০	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম
ব্রি হাইব্রিড ধান ৪	আমন	১১৮	৬.৫	চাল মাঝারি চিকন স্বচ্ছ ও সাদা
ইরাটম-২৪	বোরো আউশ	১৪০-১৪৫ ১২৫-১৩৫	৬.০ ৩.৫	উচ্চ ফলনশীল, আগাম পাকে
বিনা শাইল	আমন	১৩৫-১৪০	৪.২	নাবী রোপন উপযোগী
বিনা ধান-৪	আমন	১৩০-১৩৫	৪.৭	চাল লম্বা, আগাম পাকে, চাল চিকন
বিনা ধান-৫	বোরো	১৫০-১৫৫	৭.০	উচ্চ ফলনশীল এবং চাল মোটা
বিনা ধান-৬	বোরো	১৬০-১৬৫	৭.৫	সর্বোচ্চ ফলনশীল এবং চাল মোটা
বিনা ধান-৭	আমন	১১৫-১২০	৫.০	চাল সরু ও লম্বা, মঙ্গা মোকাবিলায় কুবই কার্যকর
বিনা ধান-৮	বোরো আমন	১৩০-১৩৪	৪.৫ ৪.০	লবণাক্ত সহিষ্ণু জাত
বিনা ধান-৯	আমন	১২০-১২৫	৩.৭৫	সুগন্ধি, লম্বা, চিকন ও আগাম জাত
বিনা ধান- ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫	বোরো	১২৫-১৩০	৫.৫	গাছ মধ্যম খাটো, চাল লম্বা ও মাঝারি, লবণ সহিষ্ণু

জমি নির্বাচন

ধানের ফলন সব ধরনের জমিতে ভাল হয় না । মাঝারি নিচু ও নিচু জমিতে ধানের ফলন সবচেয়ে ভাল হয় । মাঝারি উঁচু জমিতেও ধান চাষ করা যায় । কিন্তু সেক্ষেত্রে পানি সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয় । এঁটেল, পলিএঁটেল ও পলি দো-আঁশ মাটি ধান চাষের জন্য উপযোগী ।

বীজের পরিমাণ

চারা তৈরির জন্য প্রতি কাঠা বীজতলায় ২.৫ - ৩.০ কেজি বীজ বুনতে হয় । এক কাঠা বীজতলার চারা দিয়ে ২০ কাঠা জমিতে ধানের চারা রোপণ করা যায় ।

বীজ শোধন

ধানের বীজে যাতে রোগজীবাণু না থাকে সেজন্য ওষুধ দ্বারা শোধন করে নিতে হয় । প্রতি কেজি ধান বীজ ৩০ গ্রাম এগ্রোসান জি এন বা ২০ গ্রাম এগ্রোসান এম ৪ বা অন্য কোন অনুমোদিত মাত্রার ওষুধ দ্বারা শোধন করতে হয় ।

চারা তৈরি

ধানের চারা তৈরির জন্য সাধারণত চার ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয় ।

১ । শুকনা বীজতলা;
২ । ভিজা বীজতলা;
৩ । ভাসমান বীজতলা;
৪ । দাপোগ বীজতলা ।

উঁচু ও দো-আঁশ মাটি সম্পন্ন জমিতে শুকনা বীজতলা এবং নিচু ও এঁটেল মাটি সম্পন্ন জমিতে ভিজা বীজতলা তৈরি করা হয় । আর বন্যাকবলিত এলাকায় ভাসমান ও দাপোগ বীজতলা তৈরি করা হয় । প্রচুর আলো–বাতাস থাকে ও বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে ডুবে যাবে না এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হয় । এখানে শুকনা ও ভিজা বীজতলা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

শুকনা বীজতলা

জমিতে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করতে হবে। মাটিতে অবশ্যই রস থাকতে হবে যাতে বীজ ভালোভাবে গজাতে পারে। প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। এর আগে জমি থেকে আগাছা বেছে ফেলতে হবে এবং পরিমাণ মতো পচা গোবর সার বা আবর্জনা পচা সার দিতে হবে। বীজতলায় রসায়নিক সার ব্যবহার না করাই উত্তম। হালকা বুনটের মাটি হলে ১$\frac{১}{২}$-২ টন জৈবসার দিলে ভালো হয়। বীজতলার মাপ–

বীজতলার বেডের দৈর্ঘ্য	=	সুবিধামত লম্বা
বেডের প্রস্থ	=	১০০ সে.মি
জমির আইল ও বেডের মাঝখানের দূরত্ব	=	২৫ সে.মি
প্রতি দুই বেডের মাঝখানের দূরত্ব	=	৫০ সে. মি।

এতে চারার পরিচর্যা ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে সুবিধা হয়। প্রতি দুই বেডের মাঝখানের মাটি তুলে নিয়ে বেডের উপর সমান করে দিতে হয়। এতে বেড উঁচু হয়। এরপর বীজ বেডের উপর সমানভাবে ছিটিয়ে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

ভিজা বীজতলা

এক্ষেত্রে জমিতে পানি দিয়ে ২-৩ টি চাষ ও মই দেয়ার পর ৬-৭ দিন ফেলে রাখতে হয়। এতে জমির আগাছা, খড়কুটা ইত্যাদি পচে গিয়ে সারে পরিণত হয়। এরপর আবার ২-৩ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি থকথকে কাদাময় করতে হয়। ভিজা বীজতলায় বীজ বাড়িতে গজিয়ে নিয়ে বুনা ভাল। এক্ষেত্রেও বীজতলার মাপ শুকনা বীজতলার মতোই।

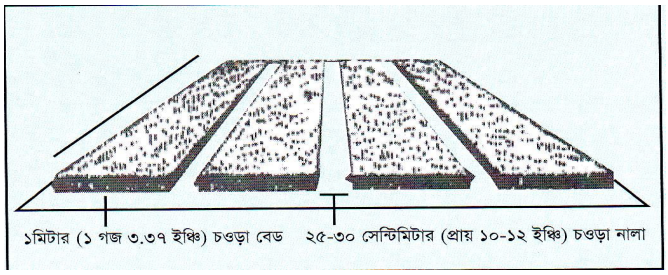

চিত্র ৭.২.১: একটি আদর্শ বীজতলা

বীজতলার পরিচর্যা

নিয়মিত পানি সেচ দিতে হয়। আগাছা হলে তা তুলে ফেলতে হয়। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা কৃষি কর্মকতার পরামর্শ নিয়ে তা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

চারা উঠানো

জাত ও মৌসুম ভেদে ২৫-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা ভালো। চারা তোলার পূর্বে বীজতলাতে পানি সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নেয়া ভালো। এতে চারা তুলতে সুবিধা হয়। চারা তোলার সময় যাতে গোড়া বা কা- ভেঙ্গে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চারা তোলার পর তা ছোট ছোট আঁটি আকারে বেঁধে নিতে হয়।

সংরক্ষণ

বীজতলা থেকে চারা তোলার পর পর মূল জমিতে লাগানো সম্ভব না হলে চারার আঁটিগুলো ছায়ার মধ্যে ছিপছিপে পানিতে রেখে দিতে হয়।

জমি তৈরি

৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে কাদাময় ও সমান করে নিতে হয়।

সার প্রয়োগ

ভালো ফলন পেতে চাইলে অবশ্যই জমিতে সার দিতে হবে। এছাড়া উচ্চফলনশীল ধানের জাত মাটি থেকে বেশি পরিমাণে খাদ্যোপোদান গ্রহণ করে বিধায় সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। গোবর বা আবর্জনা পচা জৈব সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া সারের এক তৃতীয়াংশসহ সকল রাসায়নিক সার যেমন– টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা প্রভৃতি জমিতে শেষ চাষ দেয়ার আগে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সারের বাকি দুই তৃতীয়াংশের অর্ধেক সাধারণত চারা রোপনের ১৫-২০ দিন পর এবং বাকি অর্ধেক কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। এবার দেখা যাক বিঘা প্রতি সারের পরিমান কি?

জাত ও মৌসুম ভেদে সারের মাত্রা (কেজি/বিঘা)

মৌসুম সারের পরিমাণ (কেজি/বিঘা)

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা	
রোপা আউশ	১৮	৭	১১	০	০
রোপা আমন	২০-২৬	৭-৯	১১-১৪	৮-৯	০
বোরো	২৭-৪০	১২-১৩	২০-২২	৮-১৫	১.৫

জাত ও মৌসুম ছাড়া সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও কিছু কিছু নীতিমালা মেনে চলতে হয়। যেমন

১। পাহাড়ের পাদভূমির মাটি ও লাল বেলে মাটিতে এমপি সার দেড়গুণ দিতে হয়।
২। গঙ্গাবাহিত পলিমাটি ও সেচ প্রকল্প এলাকার মাটিতে দস্তা সার বেশি পরিমাণে দিতে হয়।
৩। হাওড় এলাকার মাটিতে সার কম পরিমাণে দিতে হয়।
৪। স্থানীয় জাতের ধানে সারের পরিমাণ অর্ধেক দিলেই চলে।
৫। পূর্ববর্তী ফসলে প্রতিটি সার সঠিক পরিমাণে প্রয়োগ হয়ে থাকলে উপস্থিত ফসলে প্রতিটি সারের অর্ধেক পরিমাণ ব্যবহার করলেই চলে।
৬। পূর্ববর্তী ফসলে দস্তা সার ব্যবহার হয়ে থাকলে পরবর্তী ২টি ফসলে আর এ সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।
৭। বেলে মাটিতে এম পি সার ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়।
৮। কোন জমিতে সবুজ সার ফসলের চাষ হলে পরবর্তী ফসলে ইউরিয়া সার ৪০-৫০% কমিয়ে ব্যবহার করলেও চলে।

চারা রোপণ পদ্ধতি

সমান জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় চারা রোপণ করতে হয়। লম্বা রশির সাহায্যে সোজা সারি করে চারা রোপণ করা উত্তম। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০-২৫ সে.মি. এবং সারিতে গুছি থেকে গুছির দূরত্ব হবে ১৫-২০ সে.মি.। প্রতিটি গুছিতে ২-৩টি চারা দিতে হয়। দেরিতে রোপণ করলে চারার সংখ্যা বেশি ও ঘন করে লাগাতে হয়।

পরিচর্যা

সেচ : জমি সমান হলে মুক্ত প্লাবন পদ্ধতিতে এবং ঢালু হলে আইলবদ্ধ মুক্ত প্লাবন পদ্ধতিতে পানি সেচ দিতে হয়। দেশী জাতের ধানে পানি সেচ অবশ্যই প্রয়োজন। চারা রোপণ করার পর ৬-৭ দিন পর্যন্ত ৩-৫ সে.মি. সেচ দিতে হয়। এতে আগাছা দমন হয়। এরপর কুশি উৎপাদন পর্যায়ে ২-৩ সে.মি. এবং চারার বয়স ৫০-৬০ দিন হলে ৭-১০ সে.মি. পরিমাণ পানি সেচ দেয়া উত্তম। থোড় আসার সময় পানি সেচ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দানাপুষ্ট হতে শুরু করলে আর সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

আগাছা দমন : কমপক্ষে ৩ বার ধানের জমিতে আগাছা দমন করতে হয়।

(ক) চারা রোপণ করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে।
(খ) প্রথম আগাছা দমনের পরবর্তী ১৪ দিনের মধ্যে।
(গ) থোড় বের হওয়ার আগ মুহূর্তে। ধান ক্ষেতে সাধারণত, আরাইল, গইচা প্রভৃতি আগাছার উপদ্রব হয়।

পোকা দমন

ধান ফসলে বিভিন্ন ধরনের পোকার আক্রমণ দেখা যায়। যেমন– সবুজ পাতা ফড়িং, মাজরা পোকা, পামরী পোকা, গান্ধী পোকা, গল মাছি, শীষ কাটা, লেদা পোকা ইত্যাদি। জমিতে গাছের ডাল বা বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দিলে সেখানে পাখি বসে এবং পোকা ধরে খায়। তাছাড়া প্রতিরোধী ফসলের জাত ও বিভিন্ন দমন পদ্ধতি দ্বারা পোকা দমন করা যায়। তবে দ্রুত দর্শনের ক্ষেত্রে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিচে একটি তালিকা দেয়া হলো :

পোকার নাম	কীটনাশকের নাম
গান্ধী পোকা, পামরী পোকা, গল মাছি, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, পাতা শোষক পোকা, চুঙ্গী পোকা	সুমিথিয়ন ৫০/ ম্যালাথিয়ন ৫৭/ এম এলটি ৫৭/রগড় ৪০
বাদামী গাছ ফড়িং	বাসুডিন ১০/ফুরাডান ৩/ ডায়াজিনন ১৪
শীষ কাটা লেদা পোকা	ভেপোনা ১০০

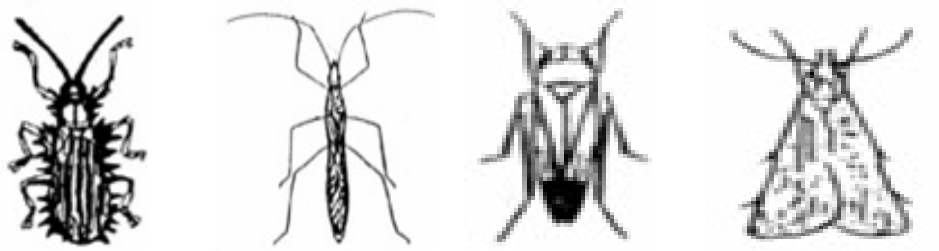

ক. পামরী পোকা খ. গান্ধী পোকা গ. সবুজ পাতা ফড়িং ঘ. মাজরা পোকা

চিত্র :৭.২.২: ধানের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পোকা

রোগ দমন : ধান ফসলে বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। যেমন– কান্ড পচা রোগ, টুংরো রোগ, বাদামী দাগ রোগ, উফরা রোগ, ব্লাস্ট রোগ ইত্যাদি। এসব রোগ সঠিক সময়ে দমন করতে না পারলে ফলন যথেষ্ট কমে যায়। বীজ শোধন, আগাছা দমন ও সুষম সার প্রয়োগে বিভিন্ন রোগ দমন হয়। এছাড়া প্রতিরোধী জাত যেমন– মালা ও গাজী জাতের ধানে বাদামী দাগ রোগ কম হয়। বিভিন্ন রোগনাশক যেমন– কুপ্রাভিট ৫০, হিনোসান ৫০ ইত্যাদি প্রয়োগ করে ও রোগ দমন করা যায়।

ধান ফসল কর্তন, মাড়াই ও সংরক্ষণ

শীষের উপরের অর্ধেক দানার শতকরা ৮০ ভাগ এবং নিচের অর্ধেক দানার শতকরা ২০ ভাগ শক্ত হলে ধান কাটার উপযুক্ত সময় হয়। তাছাড়া কিছু কিছু ধান সোনালী রং ধারণ করে এবং শীষের অগ্রভাগ হেলে পড়ে। এমতাবস্থায় ধান কেটে আঁটি বেঁধে পরিষ্কার জায়গায় নিয়ে প্যাডেল থ্রেসার বা গরু দিয়ে বা পিটিয়ে মাড়াই করতে হয়। এরপর ঝেড়ে পরিষ্কার করে ৩-৪ বার ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী ধানের ক্ষেতে বিভিন্ন ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ সনাক্ত করবে এবং এদের দমন ব্যবস্থাপনার উপর প্রতিবেদন লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

ধানের জমি সঠিকভাবে নির্বাচন করে ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে সমান ও কাদাময় করে নিতে হয়। বীজতলা থেকে সারি পদ্ধতিতে রোপণ করতে হয়। এরপর সঠিক পরিমাণ সার প্রয়োগ, পানি সেচ, আগাছা দমন, পোকা ও রোগ দমন করে উপযুক্ত সময়ে ধান ফসল কেটে মাড়াই ও ঝাড়াই এর পর রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কালিজিরা ধান কি ধরনের জাত?
(ক) স্থানীয় (খ) স্থানীয় উন্নত
(গ) উফশী (গ) স্থানীয় অনুউন্নত

২। কোন ওষুধ দ্বারা ধানের বীজ শোধন করা হয়?
(ক) সুমিথিয়ন (খ) ভিটাভ্যাক্স
(গ) এগ্রোসান জি. এন (ঘ) নগস

৩। একটি আদর্শ বীজতলার বেডের প্রস্থ কত?
(ক) ১৫০সে.মি. (খ) ৮০ সে.মি.
(গ) ১০০ সে.মি. (ঘ) ১২৫ সে.মি.

৪। কতদিন বয়সের ধানের চারা রোপণ করা ভালো?
(ক) ১০-২০ দিন (খ) ২৫-৪৫ দিন
(গ) ৫০-৬৫ দিন (ঘ) ৬৫-৭৫ দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিধু বাবু তার জমিতে বিভিন্ন জাতের ধান চাষ করেন। তিনি একজন দক্ষ ও সফল কৃষক।

৫। বিধু বাবু উফসী ধান সম্পর্ক মা জানেন-
i) পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ কম
ii) গাছের পাতা ঘন সবুজ ও পুরু থাকে
iii) গাছ লম্বা ও নরম হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। শুকনা বীজতলার জন্য বিধু বাবু কোনটি বেছে নেবেন?
ক) ৪-৫ টি চাষ দিয়ে বীজতলায় বীজ বপন
খ) বীজতলায় অবশ্যই রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়
গ) দুই বেডের মাঝে কোনো জায়গা না রাখা
ঘ) মাটি রসযুক্ত হতে হবে

পাঠ-৭.৩ পাট চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পাট চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন ।
- পাটের জাত, বীজের পরিমাণ, বপনের সময় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন ।
- পাটের পোকামাকড়, রোগ ও এগুলোর দমন সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- পাট কাটা, পাতা ঝরানো, জাগ দেয়া, আঁশা ছাড়ানো ও ধোঁয়া এবং পাট শুকানোর প্রযুক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	পাট, অর্থকরী ফসল, বীজতলা, বীজশোধন, জাগ দেয়া ।

পাট হলো একটি আঁশ ফসল । এদেশের অর্থকারী ফসলের মধ্যে পাট অন্যতম । আমরা পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকি ।

জমি নির্বাচন

উর্বর দো-আঁশ মাটি পাট চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী । তবে বেলে ও এঁটেল মাটি ছাড়া সব জমিতেই পাট চাষ করা যায় । যে জমিতে বর্ষার শেষের দিকে পলি পড়ে সে জমি পাট চাষের জন্য উত্তম । তোষা পাট উঁচু জমিতে এবং দেশী পাট উঁচু ও নিচু দু'ধরনের জমিতেই চাষ করা যায় ।

পাটের জাত, বপণ সময় ও বীজহার

নিচে দেশী ও তোষা পাটের জাত, বপন সময় ও বীজহার ছকাকারে উল্লেখ করা হলো :

জাত	বপন সময়	বীজহার (কেজি/হেক্টর)
দেশী পাট : সি.সি-৪৫, সি.ভি.ই-৩, সি.ভি.এল-১, ডি-১৫৪, এটম পাট-৩৮	১৫ মার্চ-১৫ এপ্রিল	সারিতে ৫–৬ কেজি ছিটিয়ে ৭–৯ কেজি
তোষা পাট : ৩-৮, ৩-৯৮৯৭ (ফাল্গুনী তোষা, সি. জি. (চিনসূরা গ্রিন)	১৫ই এপ্রিল - ১৫ই মে	সারিতে ৩.৭৫–৫.০ কেজি ছিটিয়ে ৬–৮ কেজি

সঠিক সময়ের আগে বা পরে বীজ বুনলে আলোক সংবেদনশীলতার কারণে পাট গাছ সুষ্ঠুভাবে বাড়তে পারে না, অসময়ে ফুল দেখা দেয় এবং পাটের ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায় ।

জমি তৈরি

জমির জো অবস্থায় ৫-৬ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয় এবং জমি থেকে আগাছা, পূর্ববর্তী ফসলের গোড়া, শিকড় ইত্যাদি বেছে পরিষ্কার করতে হয় ।

সার প্রয়োগ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সুপারিশ অনুযায়ী সার ব্যবস্থা মাত্রা নিম্নরূপ :

সারের নাম	গোবর সার দিলে সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	গোবর সার না দিলে সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
গোবর	৩৭২০	০
ইউরিয়া	১২+১০০*	১০০+১০০*
টিএসপি	১৭	৫০
এমপি	২২	৯০
জিপসাম	০	৪৫
জিঙ্ক সালফেট	০	১০

উপরি প্রয়োগে ব্যবহৃতব্য

গোবর সার প্রয়োগ করতে চাইলে বীজ বপনের ১৪-২১ দিন আগে গোবর জমিতে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। শেষ চাষের সময় ইউরিয়া সারের প্রথম অংশসহ অন্যান্য সব সার ছিটিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বপন করার ৬-৭ সপ্তাহ পর প্রতি হেক্টর জমিতে ১০০ কেজি ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিতে হবে। ছিটানোর সময় ইউরিয়া দানা যেন কচি পাতায় লেগে না থাকে সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। কারণ এতে পাটের পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রৌদ্রজ্জ্বল দিনে উপরি প্রয়োগ করা কাম্য।

বীজ শোধন

বীজ বপন করার আগে শোধন করে নেয়া উত্তম। প্রতি কেজি পাট বীজের সাথে ২০ গ্রাম সেরিসান বা এগ্রোসান জি এন অথবা ২০ গ্রাম ব্যাভিস্টিন ৫০% বা ক্যাপটান ৭৫% ওষুধ মিশিয়ে বীজ শোধন করে নেয়া উচিত। বীজ শোধনকারীর রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

বপন পদ্ধতি

সারিতে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়। সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সে.মি. এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ৭-১০সে.মি। বীজ বেশি পরিমাণে বোনা হলে বীজ খরচ বেশি ছাড়াও জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলতে খরচ বেশি পড়ে। বেশি পাতলা হলে গাছে শাখা–প্রশাখা গজায়, ঘন হলে জীর্ণ শীর্ণ হয়, উত্তম আঁশ প্রাপ্তির জন্য কোনটাই কাম্য নয়।

পরিচর্যা

চারা পাতলাকরণ ও আগাছা দমন : চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর একবার ঘন জায়গায় দূর্বল চারাগুলো তুলে ফেলা ও জমির আগাছা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এর ১৫ দিন পর আরও একবার চারা পাতলাকরণ ও আগাছা তুলে ফেলা আবশ্যক। প্রতি হেক্টর জমিতে ৪,৪০,০০০ টি চারা থাকলে কাঙ্ক্ষিত ফলন আশা করা যায়।

পোকামাকড় দমন : পাট ক্ষেতে বিছা পোকা, পাটের এপিওন, ঘোড়া পোকা, উড়চুঙ্গা, মাকড় ইত্যাদির আক্রমণ হয়ে থাকে। কৃষি কর্মকর্তা, ব্লক সুপারভাইজারের পরামর্শ অনুযায়ী এগুলো দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ক : বিছা পোকা খ : ঘোড়া পোকা গ : মাকড়

চিত্র ৭.৩.১: পাটের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পোকা

রোগ দমন : পাটগাছ ঢলে পড়া, কা- পচা, কালো পট্রি, শুকনো ক্ষেত, গোড়া পচা ইত্যাদি রোগ দেখা যায়। এগুলো দমনের জন্য থানা কৃষি কর্মকর্তা বা ব্লক সুপারভাইজারের পরামর্শ নিন।

পাট কাটা ও আঁটি বাঁধা

উন্নতমানের আঁশের জন্য গাছে ফুল ধরার সময় পাট কাটতে হয়। তবে এক্ষেত্রে ফলন কম হয়। ভালো ফলন ও আঁশ পাওয়ার জন্য ফুল থেকে ফল ধরার সময় পাট কাটার উত্তম সময়। বেশি মোটা করে আটি বাঁধলে পচতে বেশি সময় লাগে। এ জন্য ১৫-২০ সে.মি. ব্যাসের আঁটি বাঁধতে হয়।

পাতা ঝরানো ও গোড়া ডুবানো

পাট জাগ দেয়ার আগে পাতা ঝরিয়ে নেয়া উচিত। কারণ পচনকারী অণুজীব পাটের শক্ত কা-ের চেয়ে নরম পাতা বেশি পছন্দ করে। এজন্য পাতা থাকলে পাট পচতে অসুবিধা হয়। আঁটি বাঁধার পর আটির অগ্রভাগকে অপর আঁটির গোড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয় এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে সাজাতে হয়। ৪-৫ দিন পর আঁটিগুলো তুলে একটু ঝাঁকুনি দিলেই পাতা ঝরে পড়বে। পাট গাছের গোড়া মোটা ও শক্ত বিধায় মধ্য ও অগ্রভাগের তুলনায় দেরিতে পচে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য গোড়ার দিকটা ৩-৪ দিন পানির ভিতর রেখে আঁটিগুলো খাড়াভাবে স্তূপ করে রাখা হয়। এরপর জাগ দিলে পাটের আগা-গোড়ার একসাথে পচনক্রিয়া শুরু হয়।

জাগ দেওয়া

পাটকে পচানোর জন্য পাটের আঁটিগুলো সাজিয়ে পানিতে ডুবিয়ে রাখাকে জাগ দেওয়া বলা হয়। কম স্রোতবিশিষ্ট পরিষ্কার পানিতে পাট জাগ দিতে হয়। বদ্ধ পানিতেও জাগ দেওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে প্রতি ১০০ আটির জন্য ১ কেজি ইউরিয়া সার জাগের উপর ছিটিয়ে দিতে হয়। এতে পচনক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং আঁশের মান ভালো হয়। বেশি পরিমাণ লৌহযুক্ত পানিতে পাট জাগ দেওয়া উচিত নয়। এতে পাটের ট্যানিনের সাথে লৌহযুক্ত হয়ে পাটের আঁশের রং কালো করে ফেলে। ফলশ্রুতিতে আঁশের গুণগতমান কমে যায়।

জাগের আকার বিভিন্ন রকম হতে পার। যেমন– পাটের আঁটির পোড়া মাথা একসাথে সাজিয়ে বেঁধে দিতে হয়। পরে দ্বিতীয় স্তরও একই নিয়মে সাজাতে ও বেঁধে দিতে হয়। জাগের উপর মাটি কলাগাছ, ঝিগাগাছ প্রভৃতি ব্যবহার করে জাগ ডুবানো বিজ্ঞানসম্মত নয়। এতে পাটের আঁশের রং কালো হয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায় হলো জাগের দুই পার্শ্বে শক্ত খুঁটি পুতে জাগ ডুবানো। তবে কচুরিপানা, পাথর বা কংক্রীটের চাকতিও ব্যবহার করা যেতে পারে। জাগ দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে জাগের উপরে কমপক্ষে ৩০ সে.মি. এবং নিচে কমপক্ষে ৬০ সে.মি. পানি থাকে।

পাট পচনের সমাপ্তি নির্ণয়

পাট পচনের মাত্রা এমন হওয়া উচিত যাতে আঁশগুলো একটির সাথে অন্যটি লেগে না থাকে। জাগ দেবার ১০-১১ দিন পর থেকেই পাটের পচন পরীক্ষা করে যেতে হবে। কৃষকরা সাধারণত জাগ থেকে ৪-৫ টি পাট গাছ টেনে বের করে ছাল ছাড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখে। তবে বিজ্ঞানসম্মত উপায় হলো ২-৩ টি পাট গাছ জাগ থেকে বের করে তার মাঝখান থেকে ২.৫ সে. মি. পরিমাণ ছাল কেটে তা একটি পানি ভর্তি শিশির ভিতর নিয়ে ঝাঁকাতে হবে। পরে এই ছালগুলো পুনরায়

পরিষ্কার পানি ভর্তি শিশির ভিতর নিয়ে ঝাঁকানোর পর যদি দেখা যায় যে আঁশগুলো ভালোভাবে পৃথক হয়ে গেছে তবে বুঝতে হবে পাটের পচন শেষ হয়েছে। সাধারণত পাট পচতে ১৫-২৫ দিন সময় লাগে।

আঁশ ছাড়ানো ও পরিষ্কারকরণ

পচার পর পাট গাছ থেকে দু'ভাবে আঁশ ছাড়ানো যায়, যথা–

- শুকনো জায়গায় বসে প্রতিটি পাট গাছ থেকে আলাদা আলাদাভাবে আঁশ ছাড়িয়ে নেয়ার পর কায়েকটি পাট গাছের আঁশ একত্রে করে ধুয়ে নেওয়া হয় এবং আঁটি বেঁধে রাখা হয়। এক্ষেত্রে পাটের কাঠি ভাঙ্গা হয় না বিধায় আস্ত থাকে।
- হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত পানিতে দাঁড়িয়ে পাটের আঁটির গোড়ায় কাঠ বা বাঁশের মুগুর দ্বারা পিটানো হয়। এরপর গোড়া থেকে ৪০-৪৬ সে.মি. দূরে ভেঙ্গে পানির মধ্যে লম্বভাবে কয়েকটি ঝাঁকি দিলেই গোড়ার পাটকাঠি বের হয়ে যায়। পরে গোড়ার আঁশ হাতে পেচিয়ে নিয়ে পানির উপর সমান্তরালভাবে সামনে পিছনে ঠেলা দিলেই অগ্রভাগের পাটকাঠি বের হয়ে যায়। পরবর্তীতে আঁশগুলো ভালোভাবে ধূয়ে নিয়ে আঁটি বেঁধে রাখা হয়।

পাট পঁচানোর রিবন রেটিং পদ্ধতি

পাট পঁচানোর জন্য পর্যাপ্ত পানি না পাওয়া গেলে এই পদ্ধতিতে পাট পচানো যায়। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনিস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন সেখানে কাঁচা অবস্থাতেই পাট থেকে ছাল ছাড়িয়ে পরে অল্প পানিতে তা পঁচানো হয়। এই পদ্ধতিতে পাট থেকে পাতা ঝরে যাওয়ার পর হাতুড়ির সাহায্যে পাট গাছের গোড়া থেতলে দেওয়া হয়। এরপর একটি বাঁশের খুটির মাথা ইংরেজি V অথবা U অক্ষরের মত তৈরি করে খুটিটি পুতে নিতে হয়। এরপর ছালসহ পাটগাছ V অথবা U এর মাঝখানে রেখে ছাল দুই দিকে টান দিলে কাঠি থেকে পাটের ছাল পৃথক হয়ে যায়। এভাবে কয়েকটি গাছ থেকে ছাল ছাড়িয়ে সেগুলো একত্রে আঁটি বাঁধা হয়। এই আটিগুলো পরবর্তীতে একটি বড় চাড়ি বা অন্য কোন পাত্রে পানির মধ্যে রেখে পচানো হয়।

আঁশ শুকানো ও সংরক্ষণ

প্রখর সূর্যালোকে বাঁশের আড় তৈরি করে তাতে পাটের আঁশ শুকানো হয়। আঁশ বেশি শুকালে তা ভঙ্গুর হয় এবং কম শুকালে ভিজা থাকে বিধায় পচনক্রিয়া শুরু হয়। এতে আঁশের গুনগত মান নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সঠিকভাবে পাটের আঁশ শুকিয়ে নেয়ার পর সুন্দর করে বেঁধে গুদামে সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন

জাতভেদে ফলনের তারতম্য হয়। তোষা পাটের তুলনায় দেশী পাটের ফলন সামান্য বেশি হয়। দেশী পাটের ফলন প্রতি হেক্টরে ৪.৫-৫.৫ টন এবং তোষা পাটের ফলন ৪-৫ টন পর্যন্ত হয়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাট অন্যতম। এদেশের মাটি, জলবায়ু ও পরিবেশ পাট চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। উর্বর দো-আঁশ মাটি পাট চাষের জন্য উত্তম। জো অবস্থায় ৫-৬ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে পাটের জমি তৈরি করতে হয়। জমি তৈরির শেষচাষের সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইউরিয়াসহ সকল সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। ফুল থেকে ফল ধরার সময় পাট কাটলে ভালো আঁশ ও ফলন পাওয়া যায়। এছাড়া পাতা ঝরানো, জাগ দেওয়া আঁশ ছাড়ানো ও শুকানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কোন্ মাটি পাট চাষের জন্য উত্তম?
(ক) এঁটেল (খ) দোঁআশ
(গ) বেলে (ঘ) পলি

২। কোন্‌টি দেশী পাটের জাত?
(ক) এটম পাট-৩৮ (খ) ও-৮
(গ) ও-৯৮৯৭ (ঘ) সি. জি.

৩। প্রতি হেক্টর জমিতে কাঙ্ক্ষিত পাট গাছের সংখ্যা কত?
(ক) ৩,০০০০০ টি (খ) ৫, ৫০,০০০ টি
(গ) ৪, ৪০,০০০ টি (ঘ) ২,০০০০০ টি

৪। জাগ ডুবানোর ক্ষেত্রে কোন্‌টি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি?
(ক) মাটি দিয়ে জাগ ডুবানো (খ) কলাগাছ দিয়ে জাগ ডুবানো
(গ) কচুরিপানা দিয়ে জাগ ডুবানো (ঘ) খুঁটি পুঁতে জাগ ডুবানো

৫। পচনের পর পাট থেকে কয়ভাবে আঁশ ছাড়ানো যায় ?
(ক) দুইভাবে (খ) তিনভাবে
(গ) চারভাবে (ঘ) চারভাবে।

৬। পাট চাষ করা হয়-
i) সেরিসান দিয়ে বীজ শোধন
ii) সারিতে প্রতি হেক্টর ৫-৬ কেজি বীজ বপন করা
iii) চারা গজানোর ৩০-৪০দিন পর ঘন জায়গায় দুর্বল চারা পাতলা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। ছিটানো পদ্ধতিতে দেশী জাতের পাট হেক্টর প্রতি কত কেজি বুনতে হয়?
ক) ৭-৯ কেজি খ) ১০-১১ কেজি
গ) ১২-১৩ কেজি ঘ) ১৪-১৫ কেজি

পাঠ-৭.৪ সরিষা চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সরিষা চাষের গুরুত্ব, জমি নির্বাচন ও তৈরি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- সরিষার জাত, বপন সময় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সরিষা চাষের প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সরিষা, তেল ফসল, ইউরোসিক এসিড, খৈল, পরাগায়ন, জাবপোকা।

বাংলাদেশে তৈল ফসল হিসেবে সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। তবে এদেশের মানুষ সরিষাকেই তৈল ফসল হিসেবে বেশি চাষ করে থাকে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের মানুষ সরিষার তৈল মাথায় ও গায়ে মাখাতে অভ্যস্ত। এছাড়া রান্নার কাজে ও সর্দি-কাশি হলে নাকে–মুখে ব্যবহার করে। কিন্তু এ তেলের অন্য একটি দিক হলো– এতে ৪০ - ৪৫% ক্ষতিকর ইরোসিক এসিড থাকে যা হৃদপিন্ডে রোগ সৃষ্টি করে থাকে। তবে আশার কথা আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ সরিষার তৈল খেয়ে থাকি তাতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সরিষার বীজ থেকে তৈল নিষ্কাশনের পর যে খৈল থাকে তাতে প্রায় ৩৫% প্রোটিন এবং ৬.৪% নাইট্রোজেন থাকে। এ জন্য খৈল গৃহপালিত পশুর ভালো খাবারও বটে। খৈলে নাইট্রোজেন থাকায় ভালো জৈব সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এছাড়া সরিষার জমিতে কৃত্রিম উপায়ে অত্যন্ত অল্প খরচে মৌমাছি পালন করে বেশ মধু সংগ্রহ করা যায়। এ জন্য সরিষাকে মধু উদ্ভিদ বলা হয়। উপরন্তু মৌমাছি থাকাতে সরিষার পরাগায়ন ভালোভাবে হয় বিধায় সরিষার ফলনও বেশি হয়।

জমি নির্বাচন

পানি নিকাশের সুব্যবস্থা আছে এমন বেলে দো-আঁশ মাটি সম্পন্ন জমি সরিষা চাষের জন্য উপযোগী।

জাত, বপন সময় ও বীজ হার

সরিষার স্থানীয় ও উফশী দু'ধরনের জাত রয়েছে। নিম্নে এদের কয়েকটির নাম, বপন সময়, বীজ হার ও জীবনকাল একটি তালিকার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

জাত	জাতের নাম	বপন সময়	বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	জীবনকাল (দিন)
উফশী	কল্যাণী	মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর	৮	৭৫-৮৫
	সোনালী	মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর	৮.৫	৯০-১০৫
	সম্পদ	মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর	৯	৯০-১২০
	সম্বল	মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর	৭.৫	৯৫-১১০
স্থানীয়	রাই-৫	মধ্য অক্টোবর - নভেম্বরের শেষ	৭.৫	৯০-১০৫
	মাঘী	মধ্য অক্টোবর - নভেম্বরের শেষ	৮	৭০-৮০

বীজ শোধন

প্রতি কেজি বীজ ২.৫ গ্রাম ভিটাভ্যাক্স ২০০ বা ক্যাপটান দিয়ে শোধন করে নিয়ে বুনতে হয়।

জমি তৈরি

মাটির জো অবস্থায় আড়াআড়ি ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হবে। উল্লেখ্য যে সরিষার বীজ ছোট বিধায় মাটি অবশ্যই মিহি করতে হবে যাতে বীজ সহজেই মাটির সংস্পর্শে আসতে পারে। জমির উপরিভাগ মই এর সাহায্যে সমতল করে নিতে হবে যেন কোথাও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে না পারে।

সার প্রয়োগ

সরিষার জাত ও মাটি ভেদে সারের পরিমাণের পার্থক্য হয়ে থাকে। নিম্নে সাধারণ একটি হিসেব উপস্থাপন করা হলো :

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
কম্পোস্ট / খামারজাত সার	৭-৮ টন
ইউরিয়া	২০০ - ২৫০ কেজি
টি এস পি	১৫০ - ১৮০ কেজি
এম পি	৭৫ - ৮৫ কেজি

উল্লেখ্য ইউরিয়া সারের অর্ধেকসহ বাকি সব সার জমি প্রস্তুত করার সময় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ফুল আসার সময় জমিতে ছিটিয়ে দিতে হয়। কোন জমিতে সালফার, দস্তা ও বোরনের অভাব পরিলক্ষিত হলে স্থানীয় কৃষি কর্মীর পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জিপসাম, জিংক সালফেট ও সোহাগা (বরিক এসিড) উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সার প্রয়োগ করার পর জমিতে সেচ দিলে সরিষার ফলন আরও বৃদ্ধি পাবে। গাছে শিশির শুকিয়ে গেলে অর্থাৎ পড়ন্ত বিকেলে উপরি প্রয়োগ করা উচিত।

বপন পদ্ধতি

সরিষার বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। বীজ ছোট বিধায় বোনার সময় জমিতে সমানভাবে ছিটানো কষ্টকর হয়। এজন্য বালি বা ছাই এর যে কোন একটি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ ছিটালে জমিতে সমভাবে পড়ে। এতে জমির কোন জায়গায় গাছ ঘন আবার কোন জায়গায় পাতলা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। লাইন করেও সরিষার বীজ বোনা যায়। এতে সার, সেচ, নিড়ানি প্রভৃতি পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। এক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব সাধারণত ২৫-৩০ সে.মি. রাখা হয় এবং প্রতি লাইনে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়।

পরিচর্যা

পোকা দমন: সরিষা গাছের প্রধান ক্ষতিকারক পোকা হলো জাব পোকা। এ পোকা সরিষা গাছের কান্ড, পাতা, পুষ্প মঞ্জুরী, ফুল ও ফল থেকে রস চুষে যায় বলে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্থ হয়। ফল কুচকে যায় এবং শতকরা ৩০-৭০ ভাগ ফলন কম হতে পারে। জানুয়ারি এ আক্রমণ বেশি হয়। এ পোকার আক্রমণ দূর কতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র ৭.৪.১ : জাব পোকা

রোগ ও পরগাছা দমন : সরিষা গাছে পাতায় দাগ পড়া বা অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ হয়। এ রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে পাতায় বাদামী বা গাঢ় বাদামী দাগ পড়ে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পাতা, কা-, শুঁটি ও বীজেও এই দাগ পড়ে। এ রোগ দমনের জন্য ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ বা রোভরাল ডব্লিউপি ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১২ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে

হবে। এছাড়া সরিষা ক্ষেতে অরোবাংকি নামক এক প্রকার পরগাছা জন্মে যা সরিষার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। অরোবাংকি দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিড়ানি দিয়ে জমি থেকে উঠিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

ফসল কাটা, মাড়াই ও ঝাড়াই

কোন্ জাতের সরিষা কতদিন পর সংগ্রহ করতে হবে তার একটি হিসেব পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া সরিষা গাছে শতকরা ৮০ - ৮৫ ভাগ গাছ হলদে হলে পরিষ্কার দিনে সকাল বেলা গাছ কেটে নিয়ে মাড়াই করার স্থানে নিয়ে যেতে হয়। এখানে প্রখর সূর্যালোকে ২-৩ দিন শুকানোর পর বিকেলের দিকে গরু দ্বারা মাড়াই করতে হয়। এরপর সরিষার বীজ আলাদা করে কুলা ও চালুনি ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে হয়।

বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ

পরিষ্কার বীজ রোদে ৩-৪ দিন ভালোভাবে শুকিয়ে (আর্দ্রতা ৫-৬%) নিতে হয়। এই বীজ শীতল পরিবেশ ও আর্দ্রতা কম এমন স্থানে শুকনো পরিষ্কার যে কোন পাত্রে ১-২ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ফলন

উফশী জাত : ১৫০০ - ২০০০ কেজি / হেক্টর
স্থানীয় জাত : ৯৫০ - ১১০০ কেজি / হেক্টর

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে সরিষার চাষ পদ্ধতি আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

সরিষা এদেশের বিভিন্ন তৈল জাতীয় ফসলের মধ্যে অন্যতম। সরিষার বীজ থেকে তৈল ও খৈল পাওয়া যায়। তৈলে ক্ষতিকর ইরোসিক এসিড বিদ্যমান। আর খৈল ভালো জৈব সার ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুনিষ্কাশিত বেলে দো-আঁশ মাটি সরিষা চাষের জন্য উপযুক্ত। সরিষা বীজ প্রধানত মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত বোনা যায়। সরিষা ফসলের ক্ষতিকর পোকা, পরগাছা ও রোগ হলো– যথাক্রমে জাব পোকা, অরোবাংকি এবং পাতায় দাগ পড়া রোগ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সরিষার তৈলে কোন্ এসিড বিদ্যমান?
(ক) ইরোসিক এসিড (খ) সালফিউরিক এসিড
(গ) হাইড্রোক্লোরিক এসিড (ঘ) টারটারিক এসিড

২। সরিষা বীজে শতকরা কতভাগ ইরোসিক এসিড থাকে?
(ক) ৪০-৫০ ভাগ (খ) ৫০-৬০ ভাগ
(গ) ৬০-৬৫ ভাগ (ঘ) ৬০-৭৫ ভাগ

৩। কোন উদ্ভিদকে মধু উদ্ভিদ বলা হয়?
(ক) সয়াবিন (খ) সরিষা
(গ) তিল (ঘ) তিসি

৪। কোন্ পোকা সরিষা ফসলের প্রধান শত্রু?
(ক) লেডিবার্ড বিটল (খ) ড্যামসেল ফ্লাই
(গ) জাব পোকা (ঘ) কাটুই পোকা

৫। শতকরা কত ভাগ শুটি পাকলে সরিষা ফসল কাটতে হয়?
(ক) ৪০ - ৫০ (খ) ৫০ - ৬০
(গ) ৯৫ - ১০০ (ঘ) ৮০ - ৮৫।

৬। সরিষার জাত হলো-
i) কল্যাণী ii) সিভিএল-১ iii) সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফতেমা তার বাবার ১ বিঘা জমিতে সরিষার বীজ বপন করলো। সে দেখলো সরিষা গাছের বড় ফল কুঁচকে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এজন্য সে চিন্তিত হয়ে পড়লো।

৮। ফাতেমার জমিতে কোন পোকার আক্রমণ হয়েছে?
ক) বিছাপোকা খ) চেলে পোকা
গ) জাব পোকা ঘ) ঘোড়া পোকা

৯। উক্ত পোকার আক্রমণের ফলে-
i) গাছ দুর্বল হয়ে যায়।
ii) ফুল ও ফল ধারণ বাঁধাগ্রস্থ হয়
iii) ফলন কমে যায়।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৫ মাসকালাই চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মাসকালাই চাষের জমি নির্বাচন করতে পারবেন।
- মাসকালাই এর জাতের নাম করতে পারবেন।
- মাসকালাই চাষপদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।
- মাসকালাই এর রোগ ও পোকার নাম বলতে পারবেন।
- মাসকালাই এর পোকা ও রোগ ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাসকালাই ফসল কাটা, মাড়াই ও গুদামজাতকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	মাসকালাই, ডাল ফসল, পশুখাদ্য, সবুজ সার, জীবাণুসার, আন্ত:পরিচর্যা, পোকা ও রোগ, ফলন।

বাংলাদেশের অনেক ডাল ফসলের চাষ হয়। এর মধ্যে মাসকালাই এর স্থান চতুর্থ। বাংলাদেশে মোট ডাল ফসলের ৯-১১% মাসকালাই থেকে আসে। আমাদের দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে এ ডাল ফসলের চাষ বেশি হয়ে থাকে। মাসকালাই খরা সহিষ্ণু ফসল হওয়ায় উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। এ ফসলের কাঁচা গাছ গোখাদ্য ও সবুজ সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জমি নির্বাচন

পানি জমে থাকে না এমন সুনিষ্কাশিত দোঁআশ মাটি মাসকালাই চাষের জন্য উপযোগী। নিচু থেকে উচু সব ধরনের জমিতেই মাসকালাই চাষ করা যায়।

জলবায়ু

মাসকালাই উচ্চ জলবায়ু পছন্দ করে।

জাত

মাসকালাই এর উফশী (উচ্চ ফলনশীল) ও স্থানীয়, জাত রয়েছে।
যেসব-
উফসী জাত: শরৎ, হেমন্ত, পান্থ, বিনামাস-১, বিনামাস-২
স্থানীয় জাত: সাধুহাটি, রাজশাহী

জমি তৈরি

মাসকালাই চাষের জন্য মসৃণ ও মিহিভাবে জমি তৈরির দরকার হয় না। মাটির প্রকারভেদে ২-৩ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে তৈরি করতে হয়।

বীজহার

বীজ বা ডালের উদ্দেশ্য ছিটিয়ে বুনলে প্রতি শতকে ১৪০-১৬০ গ্রাম এবং সারিতে বুনলে ১০০-১২০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। আবার গোখাদ্য বা সবুজ সারের উদ্দেশ্যে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয় এবং এক্ষেত্রে প্রতি শতকে ২০০-২৪০ গ্রাম বীজ দরকার হয়।

বীজ বপনের সময়

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাসকালাই বীজ বপন করা যায় ।

বীজ বপন পদ্ধতি

মাসকালাইয়ের বীজ সারিতে বা ছিটিয়ে বপন করা যায় । তবে ডাল বা বীজের জন্য সারিতে বপন করাই উত্তম । সারিতে বপন করার ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সে.মি এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ১০ সে.মি রাখতে হয় । সারিতে বপন করার ক্ষেত্রে বীজগুলো ২-৩ সে.মি গভীর পুতে দিতে হয় । ছিটানো পদ্ধতিতে শেষ চাষের সময় বীজগুলো ছিটিয়ে দিয়ে মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয় ।

বীজ শোধন

বীজবাহিত বিভিন্ন রোগ দমনার্থে বীজ শোধন করে নিয়ে বপন করতে হয় ।

সার ব্যবস্থাপনা

মাসকালাই চাষে প্রতি শতকে ১৬০-১৮০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩৪০-৩৮০ গ্রাম টিএসপি, ১২০-১৬০ গ্রাম এমওপি এবং ১৬-২০ গ্রাম অনুবীজ সার প্রয়োগ করতে হয় ।

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

মাসকলাইয়ের জমি তৈরির শেষ চাষের সময় সব সার প্রয়োগ করতে হয় । অণুবীজ বা জীবাণুসারে প্রয়োগ করা হলে ইউরিয়া সার দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না । প্রতি কেজি মাসকালাই বীজের জন্য ৮০ গ্রাম হারে অণুবীজ বা জীবাণুসার দরকার হয় ।

আন্ত:পরিচর্যা

১ । মাসকালাইয়ের চারা গজানোর পর আগাছা জন্মালে ১৫-২০ দিন পর নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে ।
২ । বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে জলাবদ্ধতা দেখা দিলে নালা কেটে বা অন্য কোন উপায়ে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে ।
৩ । বীজ বপনের পর প্রয়োজনে হালকা সেচ দিতে হবে ।
৪ । সেচের পর মাটির জো অবস্থায় উপরের শক্ত স্তর ভেঙ্গে দিতে হবে ।
৫ । মাসকালাই ফসলে পোকা ও রোগের উপদ্রব দেখা গেলে তা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে ।

পোকা ব্যবস্থাপনা

ক) বিছা পোকা

এ পোকার কীড়া/লার্ভা মাসকালাই ফসলের পাতা খেয়ে জালিকার মত করে ফেলে । এতে ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায় । এ পোকার কীড়াগুলো দলবদ্ধভাবে আক্রমন করে বিধায় হাত দ্বারা সংগ্রহ করে তা মেরে ফেলতে হবে । আক্রমনের তীব্রতা বেশি হলে সাইলারমেথ্রিন ইসি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ।

খ) পালস্ বিটল

গুদামজাত মাসকালাই বীজ পালস্ বিটলের পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে । এ পোকা বীজের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খায় ফলে বীজদানা হালকা হয়ে যায় । এতে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে । গুদামজাত করার আগে মাসকালাই বীজ ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হয় যাতে বীজদানায় আদ্রতা ১২% এর নিচে থাকে । অনুমোদিত মাত্রার ম্যালাথিয়ন বা সেভিন গুড়া মিশিয়ে এ পোকার আক্রমন প্রতিরোধ করা যায় ।

রোগ ব্যবস্থাপনা

ক) পাতার দাগ রোগ

আক্রান্ত পাতার উপর ছোট ছোট লালচে বাদামি গোলাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে থাকে । আক্রান্ত স্থানের কোষসমূহ শুকিয়ে গিয়ে পাতা ছিদ্র হয়ে যায় । আক্রমনের তীব্রতা বেশি হলে পুরো পাতা ঝলসে যায় । সারকোস্পোরা নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে । ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, বায়ু ও বৃষ্টির মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে থাকে । উচ্চ তাপ ও বেশি আর্দ্রতায় এ রোগ দ্রুত বিস্তারলাভ করে । রোগ প্রতিরোধী জাতের মাসকালাই যেমন- শরৎ, হেমন্ত, পান্থ চাষ করে এ রোগ পরিহার করে চলা সম্ভব । আক্রমন দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হয় ।

২। পাউডারি মিলডিউ রোগ: পাতার উপরের পৃষ্ঠে পাউডারের মতো আবরণ দেখা যায়। স্পর্শ করলে তা পাউডারের গুড়ার মতো মনে হয়। ওইডিয়াম প্রজাতির ছত্রাক এ রোগের কারণ। গাছের পরিত্যক্ত অংশ, বীজ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে থাকে। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে এ রোগের প্রকোপ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ রোগের প্রতিকারের জন্য -i) বিকল্প পোষাক ও গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ii) রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে, iii) ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে নিয়ে বপন করতে হবে ও iv) রোগের আক্রমন দেখা গেলে টিল্ট বা থিওভিট নামক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

গ) হলদে মোজাইক ভাইরাস: প্রথমে কচি পাতা আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পাতার উপর হলদে সবুজ দাগ পড়ে। এতে দূর থেকে আক্রান্ত ফসল হলদে মনে হয়। মোজাইক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়। আক্রান্ত বীজ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। সাদা মাছি এ রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে থাকে। এ রোগ প্রতিকারের জন্য- i) রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে, ii) আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, iii) শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে, iv) রোগ প্রতিরোধী জাতের মাসকালাই চাষ করতে হবে ও v) সাদা মাছি দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন স্প্রে করতে হবে।

ফসল কাটা, মাড়াই ও গুদাম জাতকরণ

পরিপক্ষ ফসল সকালের দিকে সংগ্রহ করতে হয়। জাতভেদে এক বা একাধিকবার ফসল সংগ্রহ করতে হয়। প্রথমদিকে পরিপক্ক ফল হাত দিয়ে এবং সর্বশেষ কাঁচি দিয়ে গাছগুলো কেটে নিতে হয়।

খরিপ-১ মৌসুমে মে মাসের শেষে এবং খরিপ-২ মৌসুমে অক্টোবর মাসের শেষে ফসল সংগ্রহ করা হয়। গাছগুলো রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার ও ঠান্ডা করে টিন বা মাটির পাত্রে মুখ বন্ধ করে গুদামজাত করতে হয়।

ফলন

প্রতি হেক্টরে ১.৫-২ টন হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা নিকটই কোনো মাসকালাই ফসলের ক্ষেত পরিদর্শন করে এ ফসল উৎপাদনের ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে শিক্ষকের নিকট জমা দিবে।

সারসংক্ষেপ

মাসকালাই একটি গুরুত্বপূর্ণ ডাল ফসল। এ ফসল গোখাদ্য ও সবুজ সার ফসল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। সুনিষ্কাশিত উচ-নিচু সব ধরনের জমিতেই এ ফসল চাষ করা যায়। এর উন্নত ও স্থানীয় জাত রয়েছে। এ ফসল সারিতে বা ছিটিয়ে চাষ করা হয়। এ ফসলে জীবানু সার প্রয়োগ করা হলে ইউরিয়া সার দিতে হয় না। সঠিক পন্থায় ও ঠিক সময়ে পোকা ও রোগ দমন করে এ ফসলের ভালো ফলন নিশ্চিত করা যায়। জাতভেদে হেক্টরপ্রতি এ ফসলের ফলন ১.৫-২ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। বিছাপোকার কোন্ অবস্থা মাসকালাইয়ের জন্য ক্ষতিকর?
(ক) ডিম (খ) লাভা (গ) পিউপা (ঘ) পূর্ণ বয়স্ক অবস্থা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
লিটন মিয়া মাসকালাই চাষের আগে বীজ শোধন করে জীবানু সার ব্যবহার করেন।

২। পাউডার মিলডিউ রোগের প্রতিকারের জন্য-
i) রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে
ii) ছাত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করা
iii) শস্য পর্যায় অবলম্বন করা
নিচের কোনটি সঠিক :
ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। মাসকালাই চাষে প্রতি শতকে কি পরিমাণ অনুবীজ সার প্রয়োগ করতে হয়?
ক) ১৬-২০ গ্রাম খ) ২০-২৪ গ্রাম গ) ২৪-২৮ গ্রাম ঘ) ২৮-৩২ গ্রাম

৫। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে মাসকালাইয়ের বীজ কত সেমি গভীরে পুতে দিতে হয়?
ক) ৪-৫ সেমি খ) ৩-৪ সেমি গ) ২-৩ সেমি ঘ) ২ সেমি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও
বিসকা গ্রামের হীরা মিয়া প্রতিবারের এবারেও তার জমিতে মাস কালাই চাষ করেন। কিন্তু তিনি জমিতে গিয়ে দেখন অনেক গাছের পাতার উপর হলদে দাগ পড়েছে। দূর থেকে আক্রান্ত জমি হলদে মনে হয়।

৬। হীরার জমিতে কোন রোগের আক্রমণ হয়েছে?
ক) পাতার দাগ রোগ খ) পাউডারি মিল ডিউ গ) হলদে মোজাইক ভাইরাস ঘ) ব্লাস্ট রোগ

৭। হীরার ফসলের রোগটি দমনে-
i) ম্যালথিয়ান স্প্রে করতে হবে
ii) আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে
iii) রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নবম শ্রেণির ছাত্র সুজন তার কৃষিশিক্ষা বই পড়ে রোপা আমন ও বোরো জমির প্রস্তুতি, বীজতলার প্রস্তুতি ও মূল জমি তৈরি করার কৌশল সম্পর্কে জেনে তার বাবাকে পরামর্শদিল। তার বাবা সুজন মিয়ার পরামর্শে ধান চাষ করে ভালো ফলন পেলেন।

ক) ফসল কাকে বলে?
খ) বীজ শোধন করে বপন করা উচিত-ব্যাখ্যা করুন।
গ) সুজনের পরামর্শে তার বাবা কীভাবে শুকনা বীজতলা তৈরি করবেন তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ) সুজন মিয়ার বাবার ফলন ভালো হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

২। পাট বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে এ দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এজন্য পাটকে সোনালী আঁশও বলা হয়। বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম পাটের জিনোম রহস্য আবিষ্কার করে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে তুলেছেন।

ক) পাট গাছ থেকে আঁশ ছাড়ানো হয় কয় ভাবে?
খ) উফশী ধানের ২টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত শস্যটির জাত, বপন সময় ও বীজহার তালিকা আকারে তুলে ধরুন।
ঘ) উদ্দীপকের শস্যটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

উত্তরমালা

উত্তরমালা- ৭.১ : ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। ক ৫। ক
উত্তরমালা- ৭.২ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। খ ৫। ঘ ৬। ঘ
উত্তরমালা- ৭.৩ : ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ ৭। ক
উত্তরমালা- ৭.৪ : ১। ক ২। ক ৩। খ ৪। গ ৫। ঘ ৬। ঘ ৭। গ ৮। গ ৯। ঘ
উত্তরমালা- ৭.৫ : ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। গ ৫। গ ৬। গ ৭। ঘ